Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-II, January 2026, Page No. 35-42
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.02W.046

ব্যাস: এক অন্তহীন আত্মানুসন্ধান

কৈলাশপতি সাহা, *সহকারী অধ্যাপক, রামানন্দ সেন্টেনারি কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 30.12.2025; Accepted: 03.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Shahzad Firdous is a renowned novelist to scholars. His revelation novel 'Vyasa' was first published in the 'Parbantar' in 1993. It creates a widespread stir among the readers immediately after its publication. He published around nineteen novels after that in various magazines. Not only in length, they also do not follow the traditional structural techniques of novel writing too. The significant characteristic of his novel is his narrative technique. The subject of his novels is never burdened by the plot construction, but rather it confronts the reader with the deeper truths of life. What is life? What is the purpose of life? What is the duty of man— the novel 'Vyasa' is rich in analysis of such philosophical understanding. The content of Shahzad's novels is different from each other, but in each of his novels, he wanted to depict the true nature of the ultimate crisis of human civilization. He wants to state that the advancement of modern civilization, however scientifically and technologically developed is fundamentally misguided. Such a civilization does not make for a holistic development of man. It simply contributes in the formation of a painful saga of destitute people oppressed by a class of powerful people. Such a thought of Firdaus makes the reader face to face with reality. To surrender in the time of crisis is not the end of his stories and 'Vyasa' is not an exception to this. The character in his novel is strongly determined to make their life meaningful surpassing and surviving the meaninglessness of modern life. The novel 'Vyasa' is distinct not merely because of its subject but also because of its structure. The collective consciousness of people has a special diversion in this fictional narrative. He has given a concrete shape to the human mechanism of thinking. Every character undergoes deep realization of the inner truth of life by exploring his own self. To understand life, to uncover life's mystery, he stayed in contact with the grassroots people. In the novel 'Vyasa', the philosophy of life of simple people is seen on the path of self discovery. Apparently, Vyasa is unconcerned, but profoundly connected by birth to the main narrative of the *Mahabharata*. Merged with themes of theist-atheist, consciousness-unconsciousness, grief and suffering this novel is a manifestation of Vyasa's introspection.

Keywords: Nativity, Worldview, Pluralism, Research, Humanity

'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থের 'মানবসত্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানুষের তিনটি জন্মভূমির কথা বলেছিলেন। মানুষ এক জীবনে তিনবার জন্মায় বলে তাকে ত্রিজ বলা হয়। তার প্রথম জন্মভূমি নিখিল পৃথিবী, দ্বিতীয় জন্মভূমি নিখিল ইতিহাস এবং তৃতীয় জন্মভূমি হল সর্বমানবচিত্তের মহাদেশ। মানুষের দ্বিতীয় জন্মভূমিটিকে বলা হয় স্মৃতিলোক। অতীত থেকে পূর্বপুরুষদের কাহিনি নিয়ে সেখানে তৈরি হয় কালের নীড়। এই কালের নীড়

স্মৃতির দ্বারা রচিত এবং গ্রথিত। এ শুধু একটা বিশেষ জাতির কথা নয়, দেশ কাল নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ জাতির কথা।

স্মৃতি হল বিস্মৃতির বিকাশ। স্মৃতি যেখানে অ-পরিস্ফুট সেখানে রয়েছে আমাদের বিস্মৃতির মহাবিশ্ব। এই অতি বিপুল বিস্মৃতিকে কেন্দ্র করে ফ্রয়েড গড়ে তুলেছিলেন তাঁর পার্সোনাল আনকনশাস বা ব্যক্তিগত নির্জ্ঞানের সত্য। আর তাকে ব্যবচ্ছেদ করে ইয়ুং আবিষ্কার করেন কালেকটিভ আনকনশাস বা সমষ্টিগত নির্জ্ঞানের সত্য। ইয়ুং এর মতে সমষ্টিগত নির্জ্ঞানই মানুষের মধ্যে বহন করে সমস্ত মানুষের স্মৃতি। সেই মহা অতীতকে স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন—

> "তব সঞ্চার শুনেছি আমার/ মর্মের মাঝখানে/ কত দিবসের কত সঞ্চয়/ রেখে যাও মোর প্রাণে!/ তুমি জীবনের পাতায় পাতায়/ অদৃশ্য লিপি দিয়া/ পিতামহের কাহিনী লিখিছ/ মজ্জায় মিশাইয়া।"[১]

ইয়ুং এর মতে সুপ্রচীন কাল থেকে পৃথিবীর নানা দেশের সাহিত্য ভাণ্ডারে সঞ্চিত মিথগুলি ঐ সমষ্টিগত নির্জ্ঞানেরই সৃষ্টি। মিথের স্মৃতিতে আদিম বিশ্বাস আর বাসনার সূত্রগুলি নিবিষ্ট হয়ে থাকে। মিথের ভাষাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মানবসাহিত্যে সকলের চেয়ে পুরাতন ভাষা।' পাশ্চাত্য আর্কেটাইপাল সাহিত্য বিশারদ গিলবার্ট মারে এই মিথের মধ্যে দেখেছিলেন এক 'ইন্টারন্যাল ডিউরেবিলিটি।'

২

বিশ শতকে একটি রক্তপাতহীন পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন নিয়ে শাহ্‌যাদ ফিরদৌস স্বল্পায়তনের 'ব্যাস' উপন্যাসটি রচনা করেছেন। মহাভারত সহ অন্যান্য পৌরাণিক গ্রন্থে ব্যাসের জীবন সম্পর্কে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায় তা একটি চরিত্র সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট নয়। ধর্ম দর্শন রাজনীতি ইত্যাদি জীবনের গভীর প্রসঙ্গে মহাভারতে তাঁর দীর্ঘ ভাষণ রয়েছে, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে প্রায় অনেকটাই বলা হয়নি। তিনি সঙ্কটকালে আবির্ভূত হন, জ্ঞান দান করেন এবং তারপর চলে যান এই পর্যন্ত। তাঁর নিজের এবং পুত্র শুকের জন্মবৃত্তান্ত, অপুত্রক হস্তিনাপুর রাজপরিবারের জন্য পুত্র উৎপাদন, শুকের আত্মজ্ঞান লাভের জন্য সর্বস্ব ত্যাগের মধ্যে বাৎসল্যের তীব্র প্রকাশ এরকম দুই একটি কাহিনি ছাড়া সবই আভাস ইঙ্গিতে সমগ্র মহাভারত জুড়ে ছড়ানো রয়েছে। ঔপন্যাসিক শাহ্‌যাদ ফিরদৌস সেই টুকরো টুকরো আভাসগুলিকে সংগ্রহ করে একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাস চরিত্র নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছেন। ব্যাসকে নিয়ে শাহ্‌যাদ প্রথমে চলচ্চিত্র নির্মাণের কথা ভেবেছিলেন, পরে সেটিকে উপন্যাসে রূপ দেন। শাহ্‌যাদ তাঁর উপন্যাসে প্রচলিত ফর্মুলাকে ভেঙে বিষয় ও বিন্যাসকে নিজের মত চলার সুযোগ করে দেন। স্বল্প পরিসরে অভিনব উপস্থাপনের জন্য চিত্র পরিচালক রাজা মিত্র শাহ্‌যাদকে কামু বা কাফকার সমতুল্য লেখক বলে মনে করেন।[২]

১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে 'পর্বান্তর' পত্রিকায় 'ব্যাস' উপন্যাসটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে শাহ্‌যাদ ফিরদৌসের ঔপন্যাসিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ। উপন্যাসটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক মহলে বিপুল সাড়া পড়ে যায়। এর কারণ হল উপন্যাসটির উপস্থাপন কৌশল। এর আখ্যান কাহিনি ভারে ভারাক্রান্ত নয়, বরং দার্শনিক চিন্তার মধ্য দিয়ে পাঠককে দাঁড় করিয়ে দেয় জীবন সত্যের মুখোমুখি। এই জন্য সমালোচক অলোক রায় শাহ্‌যাদকে বলেছেন— "একালের সত্যসন্ধানী এক মহৎ কথাশিল্পী।"[৩] জীবন কী? জীবনের উদ্দেশ্য কী? মানব জীবনের দায়বদ্ধতা কোথায়—ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপস্থাপনায় উপন্যাসটি সমৃদ্ধ। একটি সাক্ষাৎকারে ঔপন্যাসিক শাহ্‌যাদ জানিয়েছেন—

> "ব্যাস একটি দর্শন নির্ভর রচনা, কিন্তু সে দর্শন ছায়ার সঙ্গে কুস্তি নয়, জীবনেরই দর্শন। জীবনকে জানা বোঝা উপলব্ধি করা—সর্বোপরি জীবনকে পুনর্মূল্যায়ন করার দর্শন।"[৪]

শাহ্‌যাদ কেবল হিন্দু ধর্ম দর্শন নয়, বৌদ্ধ, খৃস্টিয় ও হিব্রু জনজাতির ধর্ম দর্শনের প্রতি সমান আগ্রহ দেখিয়েছেন। আসলে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির ধর্ম ও সম্প্রদায়ের অভ্যন্তর থেকে সত্যিকারের মানুষের সন্ধান করেছেন। যে মানুষ যুদ্ধ নয়, রক্তপাতহীন একটি পৃথিবী নির্মানের স্বপ্ন দেখায়।

ব্যাস আপাত সন্ন্যাসী হলেও আমাদের মনে রাখতে হবে তিনি একজন শিল্পী এবং সংবেদনশীল মানুষ। মহাভারত সহ বেদ বিভাজনের মতো বৃহৎ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ব্যাসদেব একাই বহু মানুষের জীবন যাপন করেছেন, বহু মানুষের পরিশ্রম একাই সম্পন্ন করেছেন এবং বহু মানুষের আবেগকে নিজের মধ্যে ধারণ করেছেন। এই জন্য তাঁর কর্মের পরিধি বিশাল এবং গুণগত মানের বিচারে সর্বকালজয়ী। তিনি হতে পেরেছেন বিশ্ব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সংকলক ও সম্পাদক। একটি জাতির তথা ভারতবর্ষের ঐক্য চেতনার উদগাতা। শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞানসহ গোটা জীবন ব্যবস্থার চিত্রক। পৃথিবীর সকল জ্ঞানপিপাসুদের অন্যতম জিজ্ঞাসার স্থল। ব্যাসদেবের মহাকাব্যিক প্রতিভার যথার্থ মূল্যায়ণ করে অধ্যাপক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী বলেছেন—

> "কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের মধ্যে ঋষিত্ব, কবিত্ব, দেবত্বের চেয়েও মানুষের সত্তাটুকুই বেশি আছে। তাঁর ঋষিত্ব তাঁকে এই পৃথিবীর মানুষকে বুঝবার গভীরতা এবং দার্শনিকতা দিয়েছে। তাঁর দেবত্ব তাঁকে মানুষের চিরন্তন কাম ক্রোধ লোভাক্রান্ত হৃদয়কে ক্ষমা করতে শিখিয়েছে। আর তাঁর কবিত্ব তাঁকে কাব্যজনোচিত বেদনা এবং সমান হৃদয়তায় মানুষের বিচিত্র কর্মাবলী নির্বিঘ্নভাবে দেখাতে শিখিয়েছে। কারণ মানুষ হয়ে ওঠার মধ্যে যে ব্যাথা যন্ত্রণা এবং অভিজ্ঞতার বৈচিত্র থাকে, জন্ম থেকে শেষ পর্যন্ত সেই ব্যাথা যন্ত্রণা এবং মানুষের বিষম বৃত্তি দেখে দেখেই তাঁর কবির অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ হয়েছে।"[৫]

শাহ্‌যাদের ব্যাস একজন জ্ঞানপিপাসু। যিনি জ্ঞান সংগ্রহের জন্য উচ্চ-নীচ, ক্ষুদ্র-মহৎ, নাস্তিক-আস্তিক বাছবিচার করেন না। বিশ্বের কোনো জ্ঞানই কারো একার নয়, একজন সামান্য মানুষের মধ্যেও মহাজ্ঞানের সম্ভাবনা সুপ্ত থাকতে পারে। যিনি জ্ঞানী তিনি সেই সম্ভাবনাকে তুলে নিয়ে নিজের ভাবনার সঙ্গে যুক্ত করেন। তারপর দীর্ঘ পরিশ্রম, অধ্যাবসায় ও চর্চায় তাকে সূত্রবদ্ধ করে পূর্ণাঙ্গ রূপদানের মাধ্যমে মানবজ্ঞানের তালিকাভুক্ত করেন। যেখানে জ্ঞান যেখানেই জ্ঞানন্বেষীকে যেতে হবে— এই তাঁর বিশ্বাস। একজন যথার্থ জ্ঞানান্বেষী জানেন যে, তাঁর প্রিয় বা অপ্রিয় মতবাদের দ্বারা বিশ্বের কিছু এসে যায় না। মানুষের জন্য যা কল্যাণকর তাই সঠিক ব্যাস কেবল জ্ঞানী নন, তিনি জ্ঞান সংগ্রাহক এবং গবেষক। সমকালের জ্ঞান সম্পর্কিত ধারণা ও সংকট তাঁর চরিত্রে লীন হয়ে আছে। দীর্ঘ এই জ্ঞান অন্বেষণের যাত্রায় তিনি নিজেকে পূর্ণ করেছেন। তাই তিনি মহাভারতের হয়েও সর্বকালের। তিনি তাঁর শিষ্য বৈশম্পায়নকে বলতে পারেন—

> "গাঁয়ের সাধারণ মানুষের কাছে আমাদের ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে যেতে হবে। না অন্নের জন্য নয়, তাদের মুখের অমৃতবাণীর জন্য। গাঁয়ের অগনিত সরল মানুষের জিভের ডগায় ঘুমিয়ে আছে ইতিহাস পুরাণ সাহিত্য কাব্য। আমাদের সেই ইতিহাস পুরাণ সাহিত্য আর কাব্যের ঘুম ভাঙাতে হবে।"[৬]

সাধারণ মানুষ আর তাদের সাধারণ শ্রমময় জীবনই হল সকল সৃষ্টির উৎস। যিনি স্রষ্টা তাঁকে যেতে হবে সাধারণ মানুষের কাছে।

উপন্যাসটির আখ্যান বৃত্তের সময়কাল হল ব্যাসের জন্ম থেকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত। এই দীর্ঘ সময়কালে তিনি বিশাল বৃহৎ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। এই প্রলম্বিত সময়কালের টুকরো টুকরো ছবি উপন্যাসের স্বল্প আখ্যান পরিসরে সমন্বিত। এই আখ্যানবৃত্তের মধ্যে কখনো এসেছে তীব্র নাটকীয়তা কখনো

এসেছে শান্ত আবেগ। ঔপন্যাসিক শাহ্‌যাদ মহাকবি ব্যাসের সঙ্গে মানুষ ব্যাসের সমন্বয় ঘটিয়ে জীবনের পূর্ণতাকে দেখাতে চেয়েছেন।

পরাশরের ঔরসে কালীর গর্ভে ব্যাসের জন্ম। শৈশবে পুত্রের মধ্যে অদম্য জ্ঞানস্পৃহা লক্ষ্য করেছিলেন পিতা পরাসর। ব্যাস যখন নিতান্ত বালক তখন তিনি বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের সন্ধান দেবার জন্য মায়ের কাছ থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে আশ্রমে নিয়ে যান। জ্ঞানপিপাসু ছাত্র এবং ব্যাসকে নিয়ে তাঁর নবনির্মিত আশ্রমে উন্মুক্ত করে দিতে চেয়েছেন সমগ্র বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার—

> "আমার শিষ্যদের ভেতর থেকে কিছু জ্ঞানপিপাসু ছেলে নিয়ে আমার নতুন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করব। কৃষ্ণের জ্ঞানস্পৃহা রয়েছে। আমি চাই বিশ্বের সমস্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার ওর সামনে উন্মুক্ত করে দিতে।"[৭]

ব্যাস জীবনাভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন লোকালয়ের পথে। জীবনকে জানার জন্য ব্যাসকে এক শূদ্রার শিষ্য করে শাহ্‌যাদ জ্ঞানের বহুত্ববাদকে উপন্যাসে স্বীকৃতি দিয়েছেন। পরাশর ও ব্যাসের বিতর্কের মধ্যে ঔপন্যাসিক যেমন জ্ঞানের বহুত্ববাদকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তেমনি জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আধুনিক চিন্তা ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। পুত্রের বিরুদ্ধে পিতা ব্যাসের অভিযোগ ছিল বেদ উপনিষদ ছেড়ে ব্যাসকে কেন শূদ্রার শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে হল? উত্তরে ব্যাস জানিয়েছেন মনুষ্যত্বের পরিচয় নিয়ে তিনি একজন মানুষের কাছে গেছেন—

> "মানুষকে সবাই পরিত্যাগ করতে পারে কিন্তু মানুষ কাউকে পরিত্যাগ করতে পারে না। ব্রাহ্মণ হয়তো শূদ্রাকে ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু মানুষ শূদ্রাকে ত্যাগ করতে পারে না। বিদ্যা মূর্খতাকে ত্যাগ করতে পারে কিন্তু মূর্খ বিদ্যাকে ত্যাগ করতে পারে না। একজন মানুষ যতক্ষণ ব্রাহ্মণ অথবা শূদ্র, জ্ঞানী অথবা মূর্খ, পিতা অথবা পুত্র, তার বেশি সময় জুড়ে সে মানুষ। আর মানুষ হলে তাকে কিছুতেই ত্যাগ করা চলে না।"[৮]

এক্ষেত্রে জ্ঞানী এবং মূর্খ উভয়ে বিদ্যার অধিকারী, তবে তাদের প্রয়োগ কৌশল আলাদা। জ্ঞানীর বিদ্যা যেমন মূর্খ বুঝবে না, তেমনি মূর্খের বিদ্যা জ্ঞানী জানবে না। যিনি প্রকৃত জ্ঞানান্বেষী তাঁকে উভয়ের কাছে থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। পুত্র ব্যাসের এই আত্মানুসন্ধানকে স্বীকৃতি দিয়ে পিতা পরাশর মহত্বের আকাঙ্ক্ষার প্রত্যাশা রাখেন।

৪

মহাভারতের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করার পরেও ব্যাস বেদ বিভাজন করেছিলেন বলে তাঁর নাম হয়েছে বেদব্যাস। প্রকৃত নাম কৃষ্ণ। দ্বীপে জন্মেছিলেন বলে দ্বৈপায়ন। সেই সময় বেদ গবেষক অনেকেই ছিলেন যারা ব্যাস নামে পরিচিত ছিলেন। বিষ্ণুপুরাণ মতে আঠাশ জন ব্যাসের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু তাদের সঙ্গে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের পার্থক্য হল, তিনি পূর্বসূরীদের প্রারব্ধ কাজ অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছেন। ফলত বেদ বিভাগকর্তা হিসেবে একমাত্র তিনি টিকে রইলেন।[৯]

ঔপন্যাসিক ষোলো অধ্যায়ে জৈমিনি, পৈল, সুমন্ত্র, বৈশম্পায়ন সহ অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে ব্যাসের কাজের গুরুত্ব বোঝানোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মানসিক স্থৈর্য ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। ব্যাসের সৃষ্টিশীল মনের পরিচয় উদঘাটনে তাঁর কাব্যিক অপূর্ণতার দিকটিও উল্লিখিত হয়েছে। সৃষ্টিশীল মানুষ তাঁর রচনার মধ্যে কখনোই পুরোপুরি তৃপ্ত নন। তাঁর রোমান্টিক সত্ত্বা সবসময় অধরা মাধুরীকে ধরতে চাই। ব্যাসের কাজের পরিধি কম নয়। বহু মানুষের বহু জীবনের পরিশ্রম তিনি যেন একাই সম্পন্ন করেছেন। তবু রাতের

অন্ধকারে একাকী শয্যায় তাঁর বার বার মনে হয়েছে এ জীবন ব্যর্থ। দিগন্ত বিস্তৃত শষ্যক্ষেতে ফসলের ভিতর অনন্ত জীবনের সম্ভাবনা দেখে তাঁর মনে হয়েছে—

> "আমাকে কী আজীবন অন্যের ক্ষেতে ফসল ফলাতে হবে? অন্যের স্ত্রীর গর্ভে অন্যের জন্য পুত্র উৎপাদন করতে হবে? কেবল অন্যের বিশৃঙ্খল রচনাকে সুশৃঙ্খল করতে হবে?"[১০]

এই আক্ষেপ একজন প্রকৃত স্রষ্টার। যিনি নতুন কিছু সৃষ্টি করতে না পারার জন্য যন্ত্রনায় কাতর হন। অব্যক্ত যন্ত্রনায় কাতর ব্যাস নদীর কিনারায় দাঁড়িয়ে জীবনের হিসেব করতে করতে আক্ষেপের সঙ্গে বলে ওঠেন—

> "হায় প্রভু এই কি আমার কাজ, আমি কি নিজের জন্য কিছুই সৃষ্টি করব না? ... সৃজনের কম্পনারহিত জড়পিণ্ডের মতো আমার সত্তা। আমি কি স্রোতে চলমান শিলাখণ্ডের মতো এক চলমান জড়পিণ্ড?"[১১]

নতুন কিছু সৃষ্টি করতে না পারার যন্ত্রনায় ব্যাস এবং শাহ্‌যাদ একাকার হয়ে গেছেন। এ কথা সত্যতা প্রমাণিত হয় ঔপন্যাসিকের মন্তব্যে—

> "জীবনযাপনের দিক থেকে এমনকি চিন্তাভাবনার দিক থেকে আমার সঙ্গে ব্যাসের কিছু মিল খুঁজে পাই। আমি বোহেমিয়ান, ব্যাসও বোহেমিয়ান। কোনো জায়গাতেই তিনি বসে থাকেননি, ঘরসংসারের বাঁধা পড়েননি। জাগতিক ব্যাপারে কম আগ্রহী অথচ সংসার থেকে দূরেও সরে যাননি। জগৎ সংসার নিয়েই তাঁর কাজ তবু জগৎ -সংসারের গোয়ালে মাথা ঢুকিয়ে দিনান্তে জাবর কাটেননি। ... চিন্তাভাবনার এবং জীবন-যাপনের এই মিলটুকুর জন্যে ধীরে ধীরে হয়তো আমি ব্যাসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি।"[১২]

মহাভারতের মতো মূল্যবান গ্রন্থ নির্মাণের জন্য যে মানসিক যন্ত্রণা ও সৃষ্টির আকাঙ্খা ব্যাসের অন্তরে ছিল তার পূর্ব প্রস্তুতিটুকু ঔপন্যাসিক এখানে কৌশলে উপস্থাপন করেছেন।

শাহ্‌যাদ প্রাচীন ভারতে জ্ঞানের আদানপ্রদান ও যুক্তি তর্ক ভিত্তিক জ্ঞানের জগতকে চিহ্নিত করার জন্য চার্বাক ও তাঁর সম্প্রদায়কে উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন। সুদীর্ঘ অধ্যয়ন ও ধ্যানের মাঝে মাঝে ব্যাস একাকী ভ্রমণের সময় মানুষ, মানুষের বিবিধ কর্মকাণ্ড, তাদের আচার আচরণ খুঁটিয়ে দেখতেন। অঞ্চল বিশেষে ও ব্যক্তি বিশেষে মানুষের বাকভঙ্গির তারতম্য লক্ষ্য করতেন। এই পর্যবেক্ষণের সময় গাঁয়ের পাহাড়ি পথের ধারে গাছের তলায় চার্বাকের সঙ্গে তাঁর আলাপ। চার্বাকের সঙ্গে তর্ক বিতর্কের পর উভয়ে উপনীত হন সৃষ্টি সত্যে। বিশ্বের সমগ্র বিশালতায় শ্রম ও সৃজনের মধ্যে নিহিত আছে সৃষ্টি। ব্যাসের সৃজনশীলতাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করে চার্বাক জানিয়েছেন—

> "যার পা মাটির যতটা গভীরে সে ততটা সৃজনশীল। যার হাত পা দুই-ই মাটির সঙ্গে সম্পর্কিত সে আরো সৃজনশীল। যে বুক দিয়ে মাটির স্পন্দনে নিজের স্পন্দন মেলাতে পারে আর সেই অনন্তবিস্তৃত যুগল স্পন্দনের অনুরণন অন্যকে শোনাতে পারে সেই-ই স্রষ্টা।"[১৩]

চব্বিশ অধ্যায়ে শুক ও ব্যাসের তর্ক-বিতর্কটি জীবনের বহুত্ববাদ সম্পর্কিত। পিতাকে শুক বলেছেন, "অতিরিক্ত ধ্যান, অখণ্ড তপস্যা আর অবিরাম অধ্যয়ন একই মন্ত্র, একই মন্তব্য, একই টীকা আর একই টিপ্পনী সহস্রবার উচ্চারণ জ্ঞানার্জন নয়, এক ধরনের বিকার!" বিরক্ত ব্যাস পুত্রের এই বক্তব্যকে নাস্তিবাদ বলে প্রতিপন্ন করতে চাইলে শুক পিতাকে জানান, "নাস্তিবাদও একটি মতবাদ।" একটি মাত্র ব্যক্তির মধ্যে সকল জ্ঞানের সমাবেশ সম্ভব নয়। তাই পৃথিবীকে জানতে হলে পৃথিবীর ভালো মন্দ, উচ্চ নীচ, অস্তি নাস্তি নির্বিশেষে সমস্ত মতবাদকে জানতে হবে। শুকের এই বক্তব্য মহাভারতে বিভিন্ন মত ও পথের বহুত্ববাদ

সম্পর্কিত। তর্কের শেষে শুক আমৃত্যু ধ্যানে চিন্তনে নিজেকে উৎসর্গ করার বাসনায় পিতার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। পুত্র স্নেহে কাতর ব্যাসের হৃদয়ে উন্মোচিত হল চরম সত্য—

> "পুত্র আর কোনদিন ফিরবে না জেনে স্নেহকাতর পিতার মতোই তাঁর চোখের কোণে অশ্রুর আভাস দেখা দিল। কিন্তু তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্বের কাছে অশ্রু যেন ভয়ে, বড় সন্ত্রস্ত চিত্তে এসে আবার উৎসমূলে ফিরে যেতে চাইছে। ধীরে, অত্যন্ত ধীর গতিতে তিনি নিজেকে নিজের ভিতর ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হলেন। আশীর্বাদ করলেন পুত্রকে, "অসতো মা সদগময়/ তমসো মা জ্যোর্তিগময়/ মৃত্যোর্মামৃতংগময়..."[১৪]

একটি রক্তপাতহীন পৃথিবী গড়ে তোলার স্বপ্ন নিয়ে শাহ্‌যাদ 'ব্যাস' উপন্যাসটি রচনা করেন। এই জন্য উপন্যাসটি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাধান্য নেই। ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে 'ব্যাস' উপন্যাসটির প্রথম পর্ব প্রকাশের চৌদ্দ বছর পর দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশিত হয় ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে। এই দীর্ঘ সময় বিরতির মধ্যে যেমন ব্যাসের চিত্রনাট্যকে উপন্যাসে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টা ছিল, তেমনি ছিল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ব্যাস সহ তাঁর শিষ্যদের মানসিক অবস্থানের পরিবর্তনগুলিকে পাঠকের কাছে উপস্থাপন করা। দ্বিতীয় পর্বে মেঘরাজের পিতা একটি মিত্রময় পৃথিবীর স্বপ্ন দেখতেন, অথচ এক নির্বোধ নিষ্ঠুর শত্রুর হাতে তাকে প্রাণ দিতে হয়। পেশাগত কারণে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে শত্রুকে ক্ষমা করে দেওয়ার পরেও তার পুত্রেরও মৃত্যু হয় সেই শত্রুর হাতে। এই দুটি ঘটনা সর্বক্ষেত্রে সংশয়, ভীতি ও হতাশার জন্ম দেয়। কারণ যোদ্ধারা যুদ্ধের মাঠ থেকে ফিরে আসার পর আবার রক্তপাতের জন্য হন্যে হয়ে ঘোরে। আমাদের প্রতিদিনকার হিংসাত্মক পাশবিক ঘটনার মধ্যে এর প্রমাণ পাই। শাহ্‌যাদ মনে করেন এই নেতিবাচক চিন্তার মধ্যে মানুষ যদি নিজেকে এবং অন্যকে গভীরভাবে ভালোবাসতে পারে তাহলে মিত্রময় পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব। এই স্বপ্নকে লালন করে তিনি গৌতম বুদ্ধের জীবনী, মহাভারত সহ গুরুত্বপূর্ণ ধর্মগ্রন্থ গুলি পাঠ করে জীবনের প্রকৃত সত্যকে জানবার চেষ্টা করেছেন।

জীবনকে বোঝার জন্য এবং জীবনের রহস্য উদঘাটন করার জন্য ব্যাস মাটির মানুষের জীবনকে আপন অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির জগতের মধ্যে এনে দেখাতে চেয়েছেন। এর মধ্যে দেখা গেছে খেটে খাওয়া মানুষ, নারী, সন্ন্যাসী, তরুণ বিদ্যার্থী, বিদ্যাশিক্ষার পরিবেশ, রাজপ্রাসাদ ও তপোবনের জীবন। আপাতভাবে তিনি নির্লিপ্ত, কিন্তু জন্মসূত্রে মহাভারতে বর্ণিত সব কটি ঘটনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আস্তিক্য-নাস্তিক্য, অজ্ঞান-জ্ঞান, দর্শন ও জীবনবীক্ষা, স্থৈর্য-প্রশান্তি, দুঃখ-বেদনা, উত্তেজনা ও শান্তরস এসবের মধ্য দিয়ে অবিরাম আনাগোনা করতে হয়েছে ব্যাসকে। ঔপন্যাসিক আখ্যানের স্বল্প পরিসরে দেখিয়েছেন কেমন করে একটি সংবেদনশীল উদার ও বহু বিস্তৃত চেতনা এই সমস্ত টুকরো টুকরো ঘটনার স্তরে সঞ্চিত হয়ে সিন্ধুতলের মণিমানিক্যে পরিণত হয়। এই সমস্ত গভীর ইঙ্গিতবহ আখ্যানের মধ্যে ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে এক একটি চরিত্র যারা ব্যক্তিজীবনের ব্যর্থতার দায় এড়াতে পারেন না, রিক্ততাকে অস্বীকার করতে পারেন না। এইসব বেদনার মধ্যে দিয়ে তারা অর্জন করেছে সৃষ্টির বিশ্বরূপ দর্শন করার ক্ষমতা। মানুষের আপাত ব্যর্থতাকে অতিক্রম করে ক্রান্তদর্শী কবি ব্যাস আত্মানুসন্ধানের পথে দেখাতে চেয়েছেন সমগ্র মানবজীবন একদিকে যেমন গভীর জটিল, অন্যদিকে তেমনই সরল।

তেইশ থেকে চৌত্রিশ অধ্যায় পর্যন্ত আখ্যানবৃত্তের টুকরো টুকরো দৃশ্যে ব্যাসের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। কুরুক্ষেত্রের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ব্যাস তাঁর শিষ্যদের নিয়ে যুদ্ধোন্মাদ সৈনিকদের উল্লাসধ্বনি শুনেছেন। দেখেছেন নৃশংস হত্যার ভয়াবহ দৃশ্য। মানুষ কী অসীম আগ্রহ নিয়ে মানুষকে হত্যা করছে। শিষ্য বৈশম্পায়নকে ব্যাস বলেছেন—

> "আমি দেখেছি ঘৃণা, মৃত্যুর অধিক ঘৃণা ! ক্রোধ ভয়ংকর হলে মৃত্যু অবধি আক্রমণ করে ভবিষ্যৎ ! ঘৃণা মৃত্যুর অধিক ভয়ংকর।"[১৫]

৬

'ব্যাস' উপন্যাসের ঘটনা খুব ঘনসন্নদ্ধ নয়, কিন্তু টুকরো টুকরো ঘটনাগুলি মূল আখ্যানকে তাৎপর্যমণ্ডিত করে তুলেছে। মুখ্য চরিত্র সংখ্যায় বেশি নয়, কিন্তু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের অবস্থান স্পষ্ট। গৌণ চরিত্রগুলি যৌথভাবে তাৎপর্যমণ্ডিত। মূল চরিত্র ব্যাস আগাগোড়া একই রকম থাকেননি। মূল ঘটনা ও অন্যান্য চরিত্রগুলির সঙ্গে সংঘাতে ও সংলাপে ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয়েছে। চরিত্র ও ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে তিনি গভীর বোধ অর্জন করেছেন এবং অন্তহীন আত্মানুসন্ধানে সক্রিয় থেকেছেন। ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন জ্ঞান বা তপস্যা দিয়ে নয়— উৎপাদকের শ্রম এবং কৃষকের জীবনবীক্ষাকে আত্মস্থ করতে না পারলে মহাকাব্য রচনা করা যায় না। পণ্ডিতেরা চিন্তা ও মননের মূল্যকে স্বীকার করেন, কিন্তু একজন যথার্থ মণীষী জানেন কেবল শুষ্ক পাণ্ডিত্য দিয়ে যেমন নতুন কিছু সৃষ্টি করা যায় না, তেমনি শুধু শ্রম সার্বিক বিকাশের পথ হতে পারে না। এই দুয়ের সংমিশ্রণে সঞ্চারিত হয় সৃষ্টিশীল উপলব্ধি।

মহাকাব্য রচয়িতাকে নায়ক হিসেবে তুলে ধরার এই প্রচেষ্টা বাংলা সাহিত্যে অভিনব। এর জন্য শাহ্‌যাদকে বিশাল কলেবরের পৌরাণিক উপন্যাস লিখতে হয়নি। দুই খণ্ড মিলে মাত্র একশো ছাব্বিশ পৃষ্টার মধ্যে তিনি ব্যাসকে নির্মান করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর ভিতর থেকে এমন এক নায়ক চরিত্র বেরিয়ে এসেছেন যিনি কোথাও থেমে থাকেন নি। সমালোচক বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য বলেছেন—

> "অন্তরের ঐশ্বর্যে দুঃখ দারিদ্র কলঙ্ক সম্মান খ্যাতি সবকিছু অতিক্রম করে পূর্ণতার অভীপ্সায় নিজেকে নতুনরূপে নির্মাণ করেছিলেন। বাংলা সাহিত্য এর আগে কোনদিনই এই ধরনের নায়ক পায়নি।"[১৬]

৭

শাহ্‌যাদ নৈরাশ্যবাদী লেখক নন, তিনি মানুষের হিংসা, ঘৃণা, জিঘাংসা, প্রবৃত্তিকে শেষ কথা বলে মনে করেন নি। ভাবেননি রাজনীতিতে কিংবা ক্ষমতার দম্ভোক্তিতে ঘৃণার জয় অবশ্যম্ভাবী। জ্ঞানী-মূর্খ, ধনী-মানী নির্বিশেষে মনুষ্যত্ববোধের উত্তরণে কালের স্বার্থকতা নিহিত। সমালোচকের ভাষায় শাহ্‌যাদের ব্যাস আশাবাদী—

> "প্রতিরোধের মাটিতে পা ডুবিয়ে মাটিতে বুকের স্পন্দন জাগিয়ে সাক্ষর-নিরক্ষর, বিদ্বান-মূর্খ সকলের মনুষ্যত্বে এগোতে হবে। মনুষ্যত্ব, মানুষ 'সত্য' থেকে বড়, যুগে যুগে 'সত্য' পাল্টায়, মানুষ থাকে। সেই ব্যাসই বাইরের ইতিহাসে দেখেন ঘৃণা, অনাগত ভবিষ্যতেও তাই। কালের ক্রিয়ায় এই ঘৃণার আমূল উৎপাটন চাই। তিনি কালের করাল রূপের বর্ণনা ভবিষ্যতের জন্য এঁকে রাখতে চান— তাঁর মহাভারত অঙ্কনে। ঘণার বিরুদ্ধে তাঁর এই মহাকাব্যিক প্রতিবাদ। ব্যাস এভাবেই আমাদের সময়ের আমাদের বাস্তবের মানুষ হয়ে ওঠেন।"[১৭]

ব্যাসের লক্ষ্য সমগ্র মানবকুলের বিচ্ছিন্নতাকে অতিক্রম করে সঙ্ঘবদ্ধ করা, খণ্ড মানবত্বের পরিবর্তে সমষ্টিগত ভাবনা, ব্যক্তির আত্মকেন্দ্রিক অন্ধকারাচ্ছনতাকে দূর করা, ব্যক্তির দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সমষ্টিগত ভাবনাকে জোরদার করা, পরস্পরের মনোভাবকে উপলব্ধি করে অকারণ ভুল বোঝাবোঝি দূর করতে অস্বচ্ছ চিন্তাজগৎকে স্বচ্ছতার দিকে নিয়ে যাওয়া। সত্য মিথ্যা উভয়কে সঠিকভাবে চিত্রিত করার জন্যই তাঁর জয় কাব্য। বৈশম্পায়নকে তাই ব্যাস বলেছেন—

> "কোনো ব্যক্তি বিশেষের গুণাবলী কিংবা মাধুর্যের দিকে নয়, সমগ্র মানবপ্রবাহের মাধুর্যকে তুলে আনতে হবে। এটাই কবির কাজ, এইটুকুই জ্ঞানীর জ্ঞান সাধনার বিষয়... আমরা যদি এই কাজটুকু সমাধা করে যেতে পারি তাহলেই দেশ গঠিত হবে, জাতি গঠিত হবে, সমগ্র বিশ্ব রূপাকৃতি প্রাপ্ত হবে এবং মানুষ মনুষ্যত্বের সন্ধান লাভ করবে।"[১৮]

এই জন্য ব্যাস রচিত মহাভারতের অভ্যন্তরে জয় এবং পরাজয়ের কাহিনি সমানভাবে বিবৃত। চরিত্রেরা সকলেই পরাজিত এবং অপরাজিত। তাঁর কাব্য মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের প্রতিবাদ। একইসঙ্গে তাঁর কাহিনি মানুষ এবং তার অন্তহীন দুর্বলতার, আবার সকল সৃষ্টিশীল মানুষের অন্তহীন আত্মানুসন্ধানের।

তথ্যসূত্র:

১) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। কথা ও কাহিনী। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ভাদ্র, ১৩৯৮, পৃ. ১০।
২) ফিরদাউস, শাহ্‌যাদ। ব্যাস, খোয়াবনামা, কলকাতা, ডিসেম্বর, ২০২২, পৃ. ১৭৬।
৩) তদেব, পৃ. ১৭৯।
৪) ব্যাস। মুখোমুখি শাহ্‌যাদ ফিরদাউস। খোয়াবনাম, পৃ. ১৫৫।
৫) ভাদুড়ী নৃসিংহপ্রসাদ, মহাভারতের ছয় প্রবীণ, আনন্দ, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ১৬।
৬) ব্যাস, পৃ. ৫৩।
৭) তদেব, পৃ. ১৯।
৮) তদেব, পৃ. ২৮।
৯) মহাভারতের ছয় প্রবীণ, পৃ. ৬।
১০) ব্যাস, পৃ. ৪৩।
১১) তদেব, পৃ. ৪৩।
১২) তদেব, পৃ. ১৩৬।
১৩) তদেব, পৃ. ৫৩।
১৪) তদেব, পৃ. ৬০।
১৫) তদেব, পৃ. ৭২।
১৬) তদেব, পৃ. ১৭৪।
১৭) বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম। শাহ্‌যাদ ফিরদাউস: উপন্যাস সন্দর্ভ। সাহিত্য মনন প্রকাশনী, কলকাতা, বৈশাখ, ১৪০৪, পৃ. ১৫।
১৮) ব্যাস, পৃ. ১০৫।